ইসরায়েলের গণহত্যা পরিকল্পনা : চলমান সংগ্রাম

Posted on June 15, 2025 by Achin Vanaik

[একদিকে ইসরায়েল রাষ্ট্র গাজা এবং তার নাগরিকদের উপর অবিরাম ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার নৃশংস কর্মকান্ডকে “আত্মরক্ষার” লড়াই বলে দাবি করে জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। ২০২৪ এর সেপ্টেম্বরে প্রকাশিতঅচিন ভানায়েকের এই নিবন্ধটি পুনরায় প্রকাশ করা হল যা হামলার পিছনে “আত্মরক্ষার” উদ্দেশ্যগুলিকে উন্মোচিত করেছে এবং জায়নবাদী দখলদার রাষ্ট্রের অন্তঃসার শূন্য দাবিগুলিকে খন্ডন করেছে।]

ইরানের সার্বভৌমত্বকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সেদেশের ভেতরে মিসাইল হানা চালিয়ে ইসমাইল হানিয়ের হত্যা এই সত্যটিকেই প্রতিষ্ঠা দেয় পালেস্তিন, বিশেষত গাজার মানুষের বিরুদ্ধে গণহত্যা পরিকল্পনা ও সন্ত্রাসী কাজকর্মে সমাপ্তি টানার কোন সদুদ্দেশ্য ইসরায়েলের নেই। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ৫০০ পালেস্তিনিয়কে অবৈধ অধিবাসী চিহ্নিত করে হত্যা করা হয়েছে। আরও এলাকা

দখলের স্বার্থে এতে প্রত্যক্ষ মদত যুগিয়েছে ইসরায়েলি পুলিশ ও সেনা। এখন এটা জলের মতো পরিষ্কার যে ২০২৩ এর ৭ই অক্টোবরে হামাস হানার বদলা হিসাবে একটা “ভারসাম্যহীন” বা “অসঙ্গত” প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইসরায়েল এটা ঘটাচ্ছে না। উদারপন্থী বা দক্ষিণপন্থী পশ্চিমা এবং ভারতীয়রা যাকে অজুহাত হিসাবে দেখিয়ে জিয়নিস্ট ইসরায়েলের পক্ষে সুর গাইছেন, বরং গাজার ওপরে এই খুনে আক্রমণ সুপরিকল্পিত। হামাসের আক্রমণ আসলে তেল আভিভের হাতে তুলে দিয়েছে বহু প্রতীক্ষিত “অছিলা” যাতে পৃথিবীর শেষতম অভিবাসী-ঔপনিবেশিক এই শক্তিটি তার দীর্ঘলালিত অবিসংবাদী জাতিবিদ্বেষী-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল করতে পারে।

পুরনো অভিবাসী-ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি নতুন পৃথিবীতে যা ঘটিয়েছিল তা বর্তমানে ইসরায়েলের পক্ষে আর ঘটানো সম্ভব নয়। যেমন দেশীয় জনজাতিকে ধরে ধরে শারীরিকভাবে নির্মূল করে এমন একটা অকিঞ্চিৎকর সংখ্যায় পৌঁছে দেওয়া যাতে প্রতিরোধের ক্ষমতাই তাঁদের আর অবশিষ্ট না থাকে। ইসরায়েলের আশা এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে অন্তত গাজাতে যদি এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ফেলা যায়, ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে দূর ভবিষ্যতেও যা করে ফেলা বেশ কঠিন। ঠিক এই কারণেই প্রভূত পরিমাণে পালেস্তিনিয় শিশু ও নারীদের হত্যা করা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে প্রজননের হার দ্রুত হ্রাস করা যায়। গাজা জনসংখ্যার ৮ শতাংশ মৃত, আহত এবং নিখোঁজ (তাঁদেরও মৃতই ধরে নেওয়া যায় কারণ তাঁরা ধ্বংসস্তুপের তলায় চাপা পড়ে আছেন)। ভারতীয় জনসংখ্যায় তার সম অনুপাত হিসাব করলে ১০ কোটিরও বেশী মানুষ নিহত ও আহত ধরে নিতে হবে। এই নিষ্ঠুর একটি জাতি-নির্মূলীকরণ প্রকল্পের পরবর্তী ধাপটি হল যত বেশী সংখ্যক সম্ভব গাজাবাসীকে “মানবিক স্থানান্তরকরণের” নামে প্রতিবেশী দেশ ও অন্যত্র ঠেলে দেওয়া যায় সেটা নিশ্চিত করা। এরপর ১৯৪৮ এর নাক্বার মতোই দেশচ্যুতদের ভবিষ্যতে কোনভাবেই ফিরে আসতে না দেওয়া।

রাফা সীমান্ত খুলে দিতে মিশরের অস্বীকৃতি এবং যে মাত্রায় ইসরায়েল গাজাবাসীর স্থানান্তরকরণ চাইছে তাতে সম্মত না হওয়ায় ইসরায়েল এবং

আমেরিকাকে অন্য কোন নকশা ছকতে হবে যাতে এই দ্বিতীয় নাক্বার শেষে একটা সুবিধাজনক ফলপ্রাপ্তি ঘটতে পারে। এটা ঠিক কবে ঘটবে তা এখনই আমরা বলতে পারি না। পূর্বে একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং পণবন্দী ফেরত দেওয়ার মধ্যে দিয়ে হামাস নেতৃত্ব শান্তি প্রক্রিয়ায় কোন অগ্রগতি আনতে পারে নি। স্বাভাবিকভাবে হামাস এখন একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি দাবি করছে। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটি নিশ্চিত করতে পারে কিন্তু অদ্যাবধি সে ইসরায়েলের গণহত্যায় মদত দিয়ে এসেছে। সাম্প্রতিককালে বেইরুটে ইসরায়েলি আক্রমণ এবং হানিয়ের ওপর মিসাইল হানা সত্ত্বেও লেবানন – হেজবুল্লা বা ইরান কেউই বর্তমান সংঘাত মাত্রার বাইরে অতিরিক্ত কোন সামরিক পদক্ষেপ নিতে চায় না।

সুতরাং গাজার জন্য যুদ্ধ পরবর্তী পরিকল্পনার মূল সূচকগুলি কী হবে তা আগাম অনুমান করে অসম্ভব নয়। প্রথমত নিরাপত্তার অজুহাতে ইসরায়েল গাজার একটি বিরাট অংশের ওপর সশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করবে। একে বানিয়ে তুলবে একটি বন্দীশিবির অথবা তার চেয়েও নিকৃষ্টতর কিছু। কারণ স্থানিকভাবে সঙ্কুচিত এই অঞ্চলে থাকবে বড় মাত্রার জনঘনত্ব। দ্বিতীয়ত ভবিষ্যৎ প্রশাসনিক সত্ত্বা ইসরায়েলের প্রতিবেশী আরব দেশগুলির (বিশেষত সৌদি তবে শুধুমাত্র নয়) সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের রাস্তা নেবে। বৃহত্তর অঞ্চলগত উদ্দেশ্যের দিকে নজর রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান ইসরায়েল সরকারের চেয়েও এটা বেশী করে চাইবে। তার পরিকল্পনা হবে এমন একটি প্রশাসনিক সত্ত্বা গঠন করা যাতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে প্রতিনিধিত্ব থাকবে (সংযুক্ত আরব আমীরশাহী অবশ্যিকভাবে সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত), এবং হামাসকে বাদ দিয়ে নির্বিষ পালেস্তিনিয় প্রতিনিধিত্ব চাইবে। আব্বাস-শাসিত পালেস্তিন অথরিটি এই রকম একটা চেহারা নিতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন পালেস্তিন অথরিটিকে এককালীন বড়মাপের অনুদান দেবে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর নিরাপত্তাজনিত ব্যায়ভার সামলাবে। আর ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার পরিবার এই যৎসামান্য উপার্জনের ওপর নির্ভর হয়ে পড়বে। ইসরায়েলি দখলদারির উপ-ঠিকাদার হিসাবে গভীর ঘৃণা ও জনরোষের নিশানা হয়েও রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাস ও ফাতাহ্

ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে প্রধান শক্তি হয়ে উঠবে।

চীনের মধ্যস্ততায় চুক্তি

এই অঞ্চলে চীনের রাজনৈতিক প্রবেশ আমেরিকার বিরক্তি উদ্রেক করলেও এখন অবধি সেই এই অঞ্চলের প্রধান বহির্শক্তি। চিন হয়ত সৌদি এবং ইরানের মধ্যে সম্পর্কে মসৃণতা আনতে ভূমিকা পালন করতে পারে, কিন্তু সৌদি এবং উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলির সাথে আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার সংক্রান্ত যে দ্বন্দ্ব ইরানের রয়েছে তা দীর্ঘ এক স্নায়ুযুদ্ধের অক্ষ তৈরি করে রেখেছে। এই প্রসঙ্গে সৌদি বা অন্যান্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি ভারসাম্যরক্ষক শক্তি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়। সমান্তরালে হামাস ও ফাতাহ্র মধ্যে ঐক্যের মাধ্যমে হামাস এবং আরও ১৪টি উপদলকে (মুস্তাফা বেরঘুতির পালেস্তিনীয় জাতীয় উদ্যোগ এবং ইসলামী জিহাদ সহ) একত্রিত করে পিএলও এর অংশীভূত করার ক্ষেত্রে চিনের উদ্যোগ বিরাট কিছু করতে পারবে এমনটা আশা না করাই ভাল। পিএলও পালেস্তিনের একমাত্র প্রতিনিধি সত্ত্বা। এখন অবধি যা হয়েছে তা হল একটি চুক্তি যার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠনের সম্ভাবনা
– যা গাজার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ইসরায়েলের কর্তৃত্বে চলে যাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করবে। প্রতিশ্রুত আগামী পালেস্তিন অথরিটি নির্বাচনে (যা শেষবারের মতো হয়েছে ২০০৬ সালে) তা গঠিত হতে পারে। এই পালেস্তিন অথরিটি এখন ফাতাহ্ ও আব্বাসের নিয়ন্ত্রণে। মনে রাখতে হবে এটি আরেকটি ঐক্যপ্রচেষ্টা। এরকম ঐক্যপ্রচেষ্টা উপর্যুপরি ধারাবাহিকভাবে এর আগে ব্যর্থ হয়েছে, সাম্প্রতিককালে এইবছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ার উদ্যোগটি সহ।

চুক্তির ঘোষণাটি অবশ্য একটি ইচ্ছার প্রতিবেদন। কিন্তু এতে প্রস্তাবিত উদ্যোগগুলি কবে বাস্তবায়িত হবে তার নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই এবং

প্রয়োগনিধি সম্পর্কেও কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞায়ন হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, এর বাস্তবায়নের শর্তই হল রাষ্ট্রপতি আব্বাসের ডিক্রি জারি, যে আব্বাস কিনা ফাতাহ্র আলোচক দলের প্রধানই নন। আব্বাস ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে সর্বদাই নিজের আধিপত্য কায়েম রাখতেই বেশী ব্যস্ত, আর তারপর যদি গাজাতে রাজত্বের আর একটু বিস্তার ঘটানো যায়, যা আবার নির্ভর করে ইসরায়েলের সাথে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমন্বয়ের ওপর, মার্কিনিদের কাছে যার গ্রহণযোগ্যতা আছে। দখলীকৃত এলাকার পালেস্তিনিয়দের কাছে পালেস্তিন অথরিটি এবং আব্বাসের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং কর্মসুচী সত্ত্বেও পালেস্তিনের মানুষ হামাসকে অনেক বেশী খাঁটি ইসরায়েল-প্রতিরোধ শক্তি হিসাবে বিবেচনা করছেন। একটা সাধারণ বিষয়ে হামাস এবং ফাতাহ্র মধ্যে একক স্বার্থ রয়েছে – তা হল যেকোন অ-পালেস্তিনিয় আরব সত্ত্বাকে প্রতিরোধ করা (যেমন সংযুক্ত আরব আমিরশাহী), দখলীকৃত এলাকার প্রশাসনিক কাঠামোয় যেন এরা কোনভাবে প্রবেশ করতে না পারে। অন্যদিকে আব্বাসের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল তার এবং ফাতাহ্ প্রভাবিত পালেস্তিন অথরিটিতে নাটকীয়ভাবে হ্রাস পাওয়া জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধার। তাই এই চুক্তি ও আব্বাসের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিককালে মে-জুন মাসে দখলীকৃত এলাকায় Palestinian Center for Policy and Survey Research এর করা একটি পোলে দেখা যাচ্ছে, ৮৯ শতাংশের বেশী মানুষ চাইছেন আব্বাস পদত্যাগ করুন, ৬০ শতাংশ চাইছেন পালেস্তিন অথরিটির অবলুপ্তি, কারণ এর নিপীড়ক, দুর্নিতিপূর্ণ, উপ-দালাল ধরনের ভূমিকা।

অন্যান্য দলগুলি এই চুক্তি থেকে কী সুবিধা পেতে চলেছে যাদের এমনিতে পর্যাপ্ত বা অর্থপূর্ণ স্বার্থ পূরণের সম্ভাবনা নেই? হামাস ভবিষ্যতে পালেস্তিন সমস্যা সমাধানের একটি পক্ষ হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। চিন, দ্বি-রাষ্ট্র তত্ত্বের জয়গান গেয়েই চলেছে আরও অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক অবস্থানের মতো। এই ধরনের অবস্থান নেওয়াই হচ্ছে ইসরায়েলের ওপর যথার্থ আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করার অপারগতাকে চাপা দিতে। অথচ এই ধরনের নিষেধাজ্ঞাই একমাত্র ইসরায়েলকে ধাক্কা দিতে পারে এবং ঐ

অঞ্চলে আরও বৃহৎ ভু-রাজনৈতিক প্রবেশ ঘটাতে পারবে। এতে চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগ চাঙ্গা হবে। যে যে রাষ্ট্রের তেল রফতানির প্রয়োজন তাদের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং মার্কিনিদের বিরক্ত করার মতো একটা ক্ষমতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র তৈরি হবে। ঘটনাচক্রে চিন হল আমদানির ক্ষেত্রে ইসরায়েলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পার্টনার (প্রথমটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এবং ইসরায়েলের রপ্তানিতে চিন প্রথম (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়), সুতরাং চিন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোন গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করবে এটা বড় বেশি আশা করা হয়ে যায়।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

দুটি মূল সত্য ইতিমধ্যে স্ফটিকস্বচ্ছ। প্রথমত কোন বৃহৎ রাষ্ট্রই পালেস্তিনের মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ, দুঃখ-কষ্ট নিয়ে আদতে চিন্তিত নয়। ‘জাতীয় স্বার্থ’ ই সাধারণভাবে বৃহৎ আকারে তাদের কাছে প্রাধান্য পেয়ে থাকে, অর্থাৎ কিভাবে এই জিয়নিস্ট জাতিবৈষম্যবাদী রাষ্ট্রটির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কে ভারসাম্য রাখা যায়। এইসব দেশের মধ্যে ভারতও আছে, ইসরায়েলের সাথে ভারতের বর্তমান সম্পর্ক পরে বিশদে বিস্তৃত হবে। আরব দুনিয়ার দেশগুলিতে সরকারের ভণ্ডামিভরা কথাবার্তা আর দেশগুলির জনগণের পালেস্তিনিদের প্রতি সত্যিকারের সহমর্মিতার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। কিন্তু পালেস্তিনের পক্ষে শক্তিশালী অনুভব থাকা সত্ত্বেও আরব দুনিয়ার শাসক সরকারগুলিকে সেখানকার জনগণ এ বিষয়ে নীতিনির্ধারণে প্রভাবিত করতে পারছেন না। ‘আব্রাহাম অ্যাকর্ড’ স্বাক্ষর করা চারটি দেশ (সৌদি, বাহারিন, মরক্কো ও সুদান) ইসরায়েলের সঙ্গে করা দ্বিপাক্ষিক শান্তিচুক্তি বাতিল করে নি। ইসরায়েলকে মদত দেওয়া পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে তেল সরবরাহ বন্ধ করে চাপ দেওয়ার রাস্তাতেও হাঁটেনি।

দ্বিতীয়ত, পালেস্তিনের দুর্ভাগ্য, সে দেশের আমসাহসী জনগণ (অল্প সময়-পর্যায় বাদ দিলে) কখনই তাঁদের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব পাননি। ফাতাহ্, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পালেস্তিনের জন্য একটি বিপর্যয়। অসলো চুক্তি প্রকৃতপক্ষে একটি বিক্রয়চুক্তি যেখানে পালেস্তিনিয় নেতৃত্ব পিএলওকে পালেস্তিনের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতির বিনিময়ে তাদের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দাবিটি ছেড়ে দিলেন। সে দাবীটি হল ইসরায়েলের পক্ষ থেকে পালেস্তিনের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনগণ হিসাবে পালেস্তিনিয় জনগণের অধিকার ও মর্যাদাকে ইসরায়েল কোনদিনও স্বীকৃত দেয় নি। পালেস্তিনের রষ্ট্রিয় সীমানা চিহ্নিত করা হয় নি। অবৈধ অধিবাসীদের প্রত্যার্পণের কোন প্রকৃত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি। ১৯৪৭-৪৮ এর ‘নাক্বা’ র ফলে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া অজস্র পালেস্তিনিয় পরিবারের ফিরে আসার অধিকার স্বীকৃত হয় নি বা যারা ফেরার মতো অবস্থায় নেই তাদের জন্য কোন ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও অসলো চুক্তিতে উল্লিখিত হয় নি। আরাফাত নেতৃত্ব কার্যত এক বান্টুস্তান এরেঞ্জমেন্ট পেয়েছিল। নবগঠিত পালেস্তিন অথরিটি আসলে কিছু পৌর ক্ষমতা ও রাষ্ট্রসংঘের সাথে সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্যর আপাত মোলায়েম প্রলেপ, তাও আবার শর্তাধীন। পরিস্থিতিসাপেক্ষে তা বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ ব্ল্যাকমেইলিং এর অস্ত্র হিসাবে পরবর্তীতে ব্যবহারের উপযোগী করে রাখা হয়েছিল।

হামাসের ভূমিকাও তথৈবচ। এর সামাজিক কর্মসুচী ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী, পিতৃতান্ত্রিক। সাংস্কৃতিকভাবে-বর্জনবাদী, এবং প্রাথমিকভাবে অ্যান্টি-সেমেটিকও। একটি নৃশংস ও অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধ সশস্ত্র প্রতিরোধের অধিকার এদের রয়েছে। কিন্তু সাধারণ ইসরায়েলি মানুষের ওপর এদের আক্রমণ অন্যায় বলে চিহ্নিত করা উচিত। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে সাধারণ পালেস্তিনিয় জনতার (দখলকৃত অঞ্চলে, লেবানন ও জর্ডনের উদ্বাস্তু শিবিরে) ওপর ইসরায়েল যে অভুতপূর্ব আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তা হাজারগুণ বেশী নারকীয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল ‘আত্মরক্ষার’ নাম করে ইসরায়েল তার অবৈধ দখলদারি

শান্তিপূর্ণ বা সশস্ত্র কোন উপায়েই বজায় রাখতে পারে না, এই মুহুর্তে যে গণহত্যা কর্মসুচী চালাচ্ছে তা তো অমার্জনীয়। হামাসের অধিকার রয়েছে সশস্ত্র প্রতিরোধের কিন্তু “সাধারণ ইসরায়েলি” মানুষের ওপর আক্রমণ একটি অত্যন্ত ভুল কৌশল। ইসরায়েলি সেনার আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ হামাসের অধিকার কিন্তু তাকে অনুধাবন করতে হবে সামরিকভাবে ইসরায়েলকে পরাস্ত করা তার পক্ষে অসম্ভব। ধর্মজিহাদে ‘শহীদ’ হবার আহবানে হয়ত নিয়মিত সংখ্যায় সেনা নিয়োগ হতে থাকবে, কিন্তু পালেস্তিনের মর্যাদা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ন্যায়ভিত্তিক অর্জন ও পরিসমাপ্তির জন্য এটি রাস্তা নয়।

আগামীর রাস্তা কী?

একদিকে ইসরায়েল যেমন পালেস্তিনিয়দের ওপর আক্রমণে নারকীয়তার নতুন সীমা উন্মোচন করছে অন্যদিকে বৈশ্বিক মতামতের একটি বড় অংশ জিয়নিজম্কে জাতিবিদ্বেষী ও বর্জনবাদী মতাদর্শ হিসাবে চিহ্নিত করছে – যে জিয়নিজম্ ছিল ইসরায়েলের “চিরস্থায়ী নির্যাতিতা” হওয়ার অজুহাত। বিশ্বের একটি বড় অংশের মানুষ একে ভণ্ডামি ও অতিকথা হিসাবে প্রত্যাখ্যান করছেন। পরিহাস হল, পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ যখন এই মত রাখছেন, তখন তাঁদের সরকার, বিশেষত মার্কিন সরকার ক্রমাগত ইসরায়েলকে মদত যুগিয়ে যাচ্ছে, জিয়নিজম্ বিরোধিতাকে সেমিটিজম্ – বিরোধিতার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার অতিসরলীকরণ করে। বৃহৎ মাত্রায়, বিশেষত পশ্চিমাদেশের মানুষের জন্য পালেস্তিনিয় মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও একাত্মতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রবাসী পালেস্তিনিয়রা এখন একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে পারলে দখলীকৃত অঞ্চলের ওপর, পিএলও-র ওপর ও নিজের দেশীয় সরকারের ওপর চাপ বৃদ্ধি করতে পারবেন।

বহুদাবিস্তৃত সচেতন বৃত্তের জনপ্রিয় ও মূল কথাটি হল ইসরায়েল পালেস্তিন

দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে একটি সরল বাইনারি যাতে প্রথমপক্ষ দুশমন এবং নিপীড়ক ও দ্বিতীয়পক্ষ তার নির্যাতনের শিকার ন্যায্যতো। কিন্তু শুধুমাত্র এই সচেতন ভাবনাটুকু সংঘাতের ন্যায়তো সুষ্ঠু ও সম্মানজনক সমাধান করতে পারবে না। অন্য রাজনৈতিক সম্পদটি হল স্বাধীনতার জন্য পালেস্তিনিয়দের প্রজন্মবাহিত অদম্য সংগ্রাম, সে দখলীকৃত অঞ্চলেই হোক বা প্রতিবেশী দেশগুলির উদ্বাস্তু শিবিরে। প্রধান প্রশ্নটি হল বর্তমানে, আঞ্চলিক ও বৈষয়িক শক্তির সম্পর্কের নকশা কিভাবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পরিবর্তিত করা যায়। কিভাবে নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বেশী বেশী করে নানা দেশের সরকারের চোখে ইসরায়েলকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। এই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও উদাহারণ স্মরণ করা দরকার, কিভাবে সেখানে বর্ণবৈষম্যবাদ ধরাশায়ী হয়েছিল। এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামই অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে।

এর শুরুয়াৎ হবে পালেস্তিনে এক নতুন নেতৃত্বের এক আবস্মিক আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে। যে নেতৃত্ব জাতি-বর্ণবৈষম্য বিরোধী ইসরায়েলের চরিত্র চিহ্নিত করে মূলত অহিংস কৌশলের ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম শুরু করবে। এর অর্থ হল এই সংগ্রামের ভরকেন্দ্র হবে দখলীকৃত অঞ্চলের বাইরে এবং ভেতরে থাকা পালেস্তিনিয়দের জন্য সমানাধিকার ও ন্যায়ের দাবী তোলা। এই দাবী দখলীকৃত অঞ্চলে বসবাসকারী, সীমানার আগে থেকে পালেস্তিনে থাকা মানুষ, পালেস্তিনের প্রতিবেশী দেশের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয়প্রার্থী এবং বিশ্বের যেকোন প্রান্তে থাকা (শুধুমাত্র উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ নয়) এই সংগ্রামকে সমর্থন জানানো পালেস্তিনিয় বংশোদ্ভূত – সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। এই ধরনের দাবি যদি সংগ্রামের কেন্দ্রে থাকে তবে তা অনেক বিস্তৃত ও বড় আকারে নবতর সামুহিক ঐক্যমঞ্চ গড়ে তুলতে পারবে। উদাহারণ, ২০২১ এর মে-জুনে ইজরায়েল, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এবং গাজায় এইধরনের ‘ইউনিটি ইন্তিফাদা’ সংগঠিত হয়েছে পূর্ব জেরুজালেমে পালেস্তিনিয়দের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে। এই ধরনের প্রতিবাদ বার বার ঘটানোর জন্য উৎসাহ প্রয়োজন। আইনসিদ্ধ জাতিবিদ্বেষ বা জাতিবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে চালিত মৌলিক

সমানাধিকার ও সমান রাজনৈতিক – নাগরিক অধিকারের জন্য অহিংস আইন অমান্য ধরনের সংগ্রামকে অবজ্ঞা করা ইসরায়েলেরে সপক্ষে থাকা সরকারগুলির পক্ষে দুদিক দিয়ে অসুবিধাজনক। সেখানকার জনগণ তো পক্ষে থাবেনই। একটি জাতিবৈষম্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে অ্যান্টি সেমেটিক দাগিয়ে দেওয়া যায় না। আর অহিংস আন্দোলনকে ‘ইসরায়েলের’ অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক বলে অজুহাত যেমন দেখানো যায় না তেমনি এর প্রত্যুত্তরে নৃশংস গণহত্যাকে ‘আত্মরক্ষার প্রয়োজন’ বলে বৈধতা দান করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। অবশ্যই ইসরায়েল যখন মাঝে মাঝেই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদীদের ওপরে নৃশংস আক্রমণ নামাবে তখন পালেস্তিনকে সামরিক সুরক্ষা নিতেই হবে। তবে আক্রমণাত্মক মিলিটারি ধরনকে সরিয়ে রেখে অহিংস আন্দোলনের ধরনটি অনেক উঁচু রাজনৈতিক মূল্য অর্জন করবে অপরদিকে থাকা হিংস্র ইসরায়েলি আক্রমণের বিরুদ্ধে।

আরেকটি সম্ভাবনা হল পশ্চিম এশিয়া/উত্তর আফ্রিকা যেখানে দীর্ঘদিন ধরে একনায়কতন্ত্র বিকশিত হচ্ছে। ফলে এর বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েকটি গণবিক্ষোভ হয়েছে এবং কিছুদিনের জন্য হলেও একনায়কতন্ত্র সরে গিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক উৎসমুখগুলি উন্মুক্ত হয়েছে। ফলে অস্থায়ী হলেও ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতা – সম্পর্কগুলির নকশার অদলবদল ঘটেছে এবং তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খানিকটা দূর্বল করেছে আর ইসরায়েলের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ঘটনাগুলি – যার শেষতম ছিল আরব বিদ্রোহ/বসন্ত ২০১০ সালে তুনিশিয়ায় শুরু হয়ে আরব লীগের বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে, মিশর, ইয়েমেন এবং লিবিয়ার শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করেছে, সিরিয়া ও বাহারিনে চরম আভ্যন্তরীণ টানাপড়েন ঘটিয়েছে। একথা সত্যি যে এই গণতান্ত্রিক পরিসর বেশীদিন স্থায়ী হয়নি এবং কর্ত্তৃত্ববাদী শাসন পুনর্বহাল হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম এশিয়া – উত্তর আফ্রিকা অঞ্চল এই অগণতান্ত্রিক শাসনের কারণে সর্বদাই ঘুমন্ত বিদ্রোহের আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছে, যা যেকোন সময়ে বিস্ফোরিত হবার সম্ভাবনা রাখে। ২০১৮ র পর থেকে সুদান, আলজেরিয়া, ইরাক, লেবাননে আভ্যন্তরীণ টালমাটাল এবং সিরিয়া ও ইয়েমেনে চলমান গৃহযুদ্ধ বুঝিয়ে দিচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে এতদঞ্চলে ব্যাপকতর জনবিদ্রোহ ঘটবে। যদি এর কোনটিতে গণতান্ত্রিক ঘরানার উদ্বোধন

ঘটে, এবং তা দীর্ঘসময় টিকে থাকতে পারে তবে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক চালচিত্রটাই বদলে যাবে। কোথায় এটা ঘটছে তার ওপর দাঁড়িয়ে আশেপাশের দেশগুলিতে তার ঢেউ লাগবে। আর যদি জর্ডন বা মিশরের মতো আঞ্চলিকভাবে ওজনদার দেশে এটা ঘটে অথবা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের দেশ সৌদি আরব অথবা উপসাগরীয় দেশগুলোর কোনটাতে ঘটে তাহলে সামগ্রিক প্রভাব আরও অনেক বেশী হবে।

ঐতিহাসিকভাবে পালেস্তিনিয়দের সংগ্রাম অনেকসময়েই এই অঞ্চলের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিতে অনুঘটকের কাজ করেছে। কিন্তু ‘আরব বসন্ত’ দেখিয়েছে বিপরীত নকশাও ক্রিয়াশীল হতে পারে। বহির্দেশীয় সংগ্রামও বৃহত্তর আশা, বিশ্বাস ও রাজনৈতিক সমর্থন যোগাতে পারে পালেস্তিনিয়দের। একথার মধ্যে একটা পরম সত্য আছে যে পালেস্তিনের স্বাধীনতার পথ কায়রো আর আম্মানের মধ্য দিয়ে যায়। কে বলতে যে সে পথ দামাস্কাস বা রিয়াধের মধ্য দিয়ে যাবে না। সারা দুনিয়ার পালেস্তিনিয়দের শুধু জোট বাঁধলে হবে না, পশ্চিম এশিয়া – উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের বৃহত্তর জনসমাজকে গণতান্ত্রিক অধিকার, সাম্য ও ন্যায়ের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ঐ অঞ্চলে একটি প্রাগ্রসর রাজনৈতিক রূপান্তর ন্যাটো সহযোগীদের ইসরায়েল সংক্রান্ত বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে ফাটল ধরাবে। বিশেষত আমেরিকার কপালে ভাঁজ পড়বে কারণ তখন ওই অঞ্চলে ক্ষমতা ও প্রভাব ধরে রাখার জন্য ইসরায়েল কোন সহায়তা যোগাতে তো পারবেই না, বোঝায় পরিণত হবে। আর এইরকম একটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ইসরায়েলে বাম-উদারপন্থী শক্তির উত্থান ঘটতেই পারে।

পালেস্তিনিয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

এখানে কতগুলি সম্ভাব্য উত্তরণের রূপরেখা কার্যকর হতে পারে যা শুধু জাতিবৈষম্য বিরোধী দাবিতে পালেস্তিনিয় ঐক্যকে গভীরতা ও বিস্তৃতি দেবে তাই নয় বরং আরব দুনিয়ার পারস্পরিক সমর্থন ও সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি

গণতান্ত্রিক উত্থানকে শক্তিশালী করবে। একইসাথে তা বর্তমান ক্ষমতা – সম্পর্কগুলির ওলট পালট করে দেবে এবং অন্য একটি ভারসাম্য তৈরি করবে যা পালেস্তিনের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের পথকে আরও সুগম করবে। এই গঠন কী হবে – একটি রাষ্ট্র না দ্বি-রাষ্ট্র, পালেস্তিনিয়দের জনগণের সিদ্ধান্তের ওপরেই বর্তাবে, ভারতের বামেদের বা অন্য কারোর ওপর বর্তাবে না। তবে ক্রমে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজার মধ্যে সংযোগ তৈরি হবে, পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী বানিয়ে একটি সার্বভৌম গড়ে তোলা যা ১৯৬৭ র সীমান্ত অনুযায়ী চিহ্নিত ইসরায়েলকে সীমায়িত রেখে তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা পালেস্তিনের পক্ষে এখন একটি সুদূর পরাহত কাজ।

ইচ্ছাকৃতভাবে ইসরায়েল ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে পালেস্তিনিয় অধিবাসীদের জন্য ভুখন্ডগত সংলগ্নতা ধ্বংস করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকা জর্ডন উপত্যকার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়। সাত লক্ষেরও বেশী অবৈধ অভিবাসীদের ইসরায়েল সরকার কখনই সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করবে না। তা করতে গেলে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য শক্তিগুলিও এই ধরনের উচ্ছেদ কার্যকর করতে চাইবে না। পালেস্তিনিয়দের ছিন্ন, আরও সঙ্কুচিত, বিভক্ত একটি বান্টুস্থান দেওয়া হবে বড়জোর, অসলোতে যা প্রতিশ্রুত ছিল আর পালেস্তিনিয় নেতৃত্ব নির্লজ্জের মতো গ্রহণও করেছিলেন। ফলত এই সংঘাত থামবার নয়।

যে কারণে একটি জিয়নিস্ট ইহুদি রাষ্ট্রের বদলে এক বা দ্বি-রাষ্ট্রের জন্য মতগঠন ও লড়াই চালানো উচিত যা হবে যথেষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ যা নিশ্চিত করবে সকলের সমান রাজনৈতিক অধিকার। তাতে জাতি বা ধর্মীয় অনুমোদন বা প্রেক্ষাপটের কোন ভূমিকা থাকবে না। জাতিবিদ্বেষী কাঠামোকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে হলে এই ধরনের যুক্তিপূর্ণ সংগ্রাম দরকার। একে অধিকতর পালেস্তিনিয় ও জিয়নিস্ট-বিরোধী ইহুদিরা সহানুভূতি ও সমর্থন জানাবেন। মূল কাজ হল সংখ্যাগুরু ইহুদি জনগণের কাছে এই মতটি গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

ভারত ও ভারতের বামেদের কী ভূমিকা হওয়া উচিত?

১৯৯২তে কগ্রেস সরকারের সাথে ইসরায়েলের একটি পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আরাফাত এতে সম্মতি দেন কারণ তখন তিনি অসলোর পথে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছেন। এরপর নরসিমা সরকার, দেবেগৌড়া, আই কে গুজরাল এবং তারপর ইউপিএ ১ ও ইউপিএ ২, সব সরকারই ইসরায়েলেরে সাথে অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রযুক্তিগত ও রাজনৈতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ঠাণ্ডা লড়াই পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক বোঝাপড়ার জন্য এটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ নালীপথ। পালেস্তিন এবং পিএলওর প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল টাকাপয়সা দেওয়া ও মৌখিক সহানুভূতি জ্ঞাপন, যদিও ইসরায়েল নিয়ম করে অসলো চুক্তিভঙ্গের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে, গাজাকে পরিণত করেছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুক্ত কারাগারে এবং একনাগাড়ে অঞ্চলটির ওপর গোলাবর্ষণ ও সামরিক হানা জারি রেখেছে। তেল আভিভ যেসব অভিযানের নাম দিয়েছে “আগাছা পরিষ্কার”।

২০০৮ সালে মনমোহন সিংহ সরকার ইসরায়েলের কাছ থেকে উদ্দিষ্ট থেকে শুরু করে গণ পর্যন্ত নজরদারির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ করে। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তে ইসারেলি জননিরাপত্তা মন্ত্রক ও ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মধ্যে একটি কার্যকারী সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়। অন্যান্য নানা সহযোগিতা ছাড়াও, সীমান্ত রক্ষা, সন্ত্রাস মোকাবিলা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতীয় বাহিনী ও পুলিশকে ইসরায়েল প্রশিক্ষণ সহায়তা দেবে স্থির হয়। এই চুক্তি প্রথম প্রয়োগ হয় যখন মে ২০১৪ তে মোদী সরকার নির্বাচন জিতে ক্ষমতা দখল করে এবং পরবর্তীতে এই ধরনের বন্দোবস্ত আরও জোরদার ও গভীর হয়। বাজপেয়ী ও মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি জমানাগুলিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে একটা আবেগী – আদর্শগত কৌশল মাত্রা যুক্ত হয়। হিন্দুত্ব ও জিয়নিজমের নৈকট্যের কারণে। তবে ইসরায়েল সূচনালগ্ন থেকেই ইহুদি জাতীয় রাষ্ট্রের বৈধতা পেয়ে গেছে, সঙ্ঘ পরিবার ও বিজেপিকে যথার্থ হিন্দু জাতীয় রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পশ্চিম এশিয়া – উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে ইসরায়েল একটি আধিপত্যকামী, সামরিক ও পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছে। কিন্তু পাকিস্থান ও চিনের উপস্থিতির কারণে দক্ষিণ এশিয়াতে ভারত সেটা করে উঠতে পারে নি। ইসরায়েল দখলীকৃত অঞ্চলে পালেস্তিনিয়দের সঙ্গে যা করতে পেরেছে তা মোদী সরকারের কাছে কাশ্মীরি জনগণকে জব্দ করার একটা অনুকরণযোগ্য শিক্ষা।

আশ্চর্য কিছু নয়, যে বিজেপি জমানায় বিশেষত মোদী চালিত গত ১০ বছরে ভারত ও ইসরায়েল সম্পর্ক গুণগতভাবে অনেক গভীর হয়েছে, এমনকি পালস্তিনের প্রতি মৌখিক সহানুভূতিও সময়ে সময়ে অনেক নীরব হয়ে গেছে কারণ ইসরায়েলের আচরণের প্রতি ভারতের রাজনৈতিক – কূটনৈতিক সমর্থন বার বার প্রকাশ্যে সোচ্চারে জ্ঞাপিত হয়েছে। সাম্প্রতিক গাজার সঙ্গে যুদ্ধে ইসরায়েলের ভূমিকাকে সরাসরি সমালোচনা তো দুরস্থান, সামান্য নিন্দা বাক্যও মোদী উচ্চারণ করেন নি। গণহত্যা নিয়েও সম্পূর্ণ নীরব, সর্বাধিক যা নয়া দিল্লির পক্ষে করা সম্ভব, তা হল মাঝে মাঝে “মানবিক যুদ্ধবিরতির” জন্য আবেদন এবং বারংবার “দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের” পক্ষে অর্থহীন বিবৃতি। আর এই গোলযোগের মধ্যে ভারতের সরকারী ও বেসরকারি সংস্থা ইসরায়েলকে বিস্ফোরক এবং ড্রোন সরবরাহ করছে এবং ভারতীয় পরিযায়ী শ্রমিক রপ্তানি করে পালেস্তিনিয় শ্রমিকদের বেআইনি বলে বিতাড়ন করা হচ্ছে ইসরায়েলে।

ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলো মুখ্যত মোদী সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত। শুধুমাত্র নির্বিকার তথ্য – সংবাদ পরিবেশন করে তারা, কোন সমালোচনা বিশ্লেষণের ধার দিয়েও যায় না। গাজা বা ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে কী ঘটছে তার ছবি মার্কিন গণমাধ্যমে যা দেখানো হয়, তার সিকিভাগ ভারতীয় চ্যানেল দেখায় না। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের আগে ভারতীয় সংসদে ৩৭টি দলের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ২৯টি দলের প্রতিনিধি পালেস্তিন – ইসরায়েল বিষয়ে একটি শব্দও খরচ করেন নি অথচ গাজাতে তখন ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি ঘটে যাচ্ছে। এই দলগুলো মনে করেছে, এই বিষয়ে নীরব থাকলে তার নিজের ঘরে

রাজনৈতিক অবস্থান বা জনপ্রিয়তায় কোন আঁচড় পড়বে না বরং পালেস্তিনের পক্ষে বললে “মুসলিম তোষণের” দায় ঘাড়ে জাঁকিয়ে বসে পড়তে পারে। যদিও এই সংঘাত মোটেই “মুসলিম” বিষয়ক নয়। যাই হোক এই দলগুলির গভীর নীরবতা একটি বিষময় সত্য উন্মোচিত করে দেয় যে ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির কতখানি সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটে গেছে।

যা দাবী করা দরকার

অন্তত কিছু নাগরিক সংগঠন ও বাম দলগুলি ইসরায়েলের ভূমিকার নিন্দা করেছে। পালেস্তিনিয় মানুষ বিশেষত গাজাবাসীর স্বপক্ষে সহমর্মিতা ও সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। ব্যাক্তিগতভাবে কিছু কংগ্রেস নেতা ইসরায়েলের ভুমিকার বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন কিন্তু সামগ্রিকভাবে পার্টি (কেরালা বাদে কারণ সেখানে বামেদের সাথে লড়াই ছিল আর মুসলিম সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনেরও দায় ছিল) নিজে কোন গণ প্রতিবাদ কর্মসুচীর উদ্যোগ নেয় নি বা অন্য কোন সংগঠনের সাথে যৌথ সহমর্মিতা প্রদর্শন কর্মসুচীতেও অংশ নেয়নি। কংগ্রেস শাসিত কর্ণাটকে অক্টোবর ২০২৩ ও জুন ২০২৪ এ বেঙ্গালুরুর পুলিশ পালেস্তিনের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন কর্মসুচী জোর করে বন্ধ করেছে। এটা মনে রাখা দরকার শুধুমাত্র পালেস্তিন-সমর্থক দল এবং বামেরাই (কংগ্রেস বা অন্য কোন বুর্জোয়া দল নয়) ইসরায়েলকে বয়কট, ইসরায়েলে বিলগ্নীকরণ এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আর্থিক নিষেধাজ্ঞার (বিডিএস) দাবিকে সমর্থন করেছে। এই দাবীর প্রচার বিশ্বজুড়ে যথেষ্ট মান্যতা অর্জন করেছে, বস্তুত ইসরায়েলকে তা অস্বস্তিতে ফেলেছে। অধিক গুরুত্বপূর্ণ হল ইসরায়েলের রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা ও বৈধতার অনেকটা অবমূল্যায়ন ঘটাতে পেরেছে বিডিএস প্রচারের আপেক্ষিক সাফল্য।

যেহেতু জিয়নিজম ও হিন্দুত্বের মধ্যে একটি তত্ত্বগত আত্মীয়তা রয়েছে, যত জিয়নিজমের মুখোশ উন্মোচিত হবে এবং তা নিন্দিত হবে তার সহজাত জাতিবিদ্বেষ ও বৈষম্যবাদী চরিত্রের কারণে তত হিন্দুত্ব ও তার নানাবিধ প্রচারকদের বিরুদ্ধে অনাস্থা তৈরির সংগ্রাম গতি পাবে। এই কারণে ভারতীয় বামেদের অবশ্যই পালেস্তিনের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সম্প্রতি সিপিআই, সিপিআইএম, সিপিআইএমএল (লিবারেশন), ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আরএসপি দাবী জানিয়েছে ভারত সরকারকে ইসরায়েলে ভারতীয় সেনা, অস্ত্র ও গোলা বারুদ সরবরাহ করা বা ইসরায়েল থেকে অস্ত্র আমদানি বন্ধ করতে হবে। ইসরায়েলের অবৈধ দখলদারি বা গণহত্যার মতো কুকর্মে সব ধরনের সহযোগিতায় ইতি টানতে হবে। ভারতীয় বামেরা আরও একধাপ এগিয়ে দাবি জানাতে পারে। ভারত সরকার যাতে ইসরায়েলের সঙ্গে সবরকম রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, আর্থিক, প্রযুক্তিগত, সামাজিক – সাংস্কৃতিক, একাডেমিক ও সামরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন এমন দাবি বামেদের জানানো উচিত। সেক্ষেত্রে ইসরায়েলে বাসরত সমস্ত ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে হবে অতঃপর। যারা থাকতে চাইবে বা ইসরায়েলি নাগরিকত্ব নিতে সক্ষম হবে তারা ব্যাতিক্রম। আগে ভারত ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকারের ক্ষেত্রে। বান্টুস্তান ধরনের নীতি সহ দক্ষিণ আফ্রিকার অনেকগুণ বেশী নিষ্ঠুর ভয়ানক জাতিবিদ্বেষী ইসরায়েলি সরকারের বিরুদ্ধে এই আচরণ করে উচিত।

অবশ্য ভারত সরকার তা করবে না। কিন্তু ভারতীয় বামেদের এই দাবী থেকে সরে না এসে ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধি করা উচিত। এই দাবীর মাধ্যমে ভারতীয় বামেরা এক ধরনের নৈতিক – রাজনৈতিক অবস্থানকে প্রকাশ করতে পারবেন সততার প্রশ্নে যা রাশিয়া ও চিনের ইসরায়েল নীতির নিরিখে তাঁদের অনেক এগিয়ে রাখবে। এই দুই শক্তির উল্লেখ এই জন্য করতে হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধমূলক আচরণের জন্য তাকে যতখানি সমালোচনা করা হয় অনেক সময়েই ভারতীয় বামেদের নানা অংশ চিন ও রাশিয়ার ইসরায়েল সংক্রান্ত অপরাধকে লঘু করে দেখেন। তবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হল এই ধরনের অবস্থান বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার মহান ঐতিহ্যের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।





[লেখাটা ইতিমধ্যে গণবার্তা শারদ সংখ্যা ২০২৪এ প্রকাশিত হয়েছে। }

About the Author

Achin Vanaik

Ppma_guest_author

A TNI Fellow and Associate since 1987, Achin Vanaik is a Retired Professor of International Relations and former Head of Department of Political Science at the University of Delhi, and a life-long activist for nuclear disarmament.

View All Posts

Achin Vanaik

+ posts
A TNI Fellow and Associate since 1987, Achin Vanaik is a Retired Professor of International Relations and former Head of Department of Political Science at the University of Delhi, and a life-long activist for nuclear disarmament.